ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ

ক্যান্সার প্রতিরোধের খাবার

গত ২ জানুয়ারি জন হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা বলেছেন, জিন (Gene) বা পরিবেশ নয়, ভাগ্য খারাপ হওয়াই অনেক ক্যান্সারের মূল কারণ। বহু মানুষ আজীবন ধূমপান করেও লাং ক্যান্সারে আক্রান্ত হন না। অনেকে আবার ধূমপান না করে বা সুস্থ সুন্দর জীবনযাপন করেও ক্যান্সারে আক্রান্ত হচ্ছেন। একে দৈবচক্র বলা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। কে কখন কীভাবে ক্যান্সারে আক্রান্ত হবেন তা নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারে না। তারপরও ক্যান্সার প্রতিরোধে লাইফস্টাইল, সংযত জীবনযাপন ও স্বাস্থ্যকর খাবারের অবদানকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মৃত্যুর কারণ ক্যান্সার। প্রতি লাখে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় ২০ জন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিবছর ক্যান্সারে মারা যায় পাঁচ লাখ মানুষ। অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাস এজন্য দায়ী। খাদ্যাভ্যাস ও লাইফস্টাইল পরিবর্তনের মাধ্যমে আমরা অনেক ধরনের ক্যান্সার থেকে পরিত্রাণ পেতে পারি বলে চিকিৎসাবিদরা মনে করেন।

স্মরণাতীত কাল থেকে ক্যান্সার আমাদের জীবনসঙ্গী। রোগ নির্ণয়ের সুষ্ঠু ও বৈজ্ঞানিক উপায় বেশি জানা ছিল না বলে আগে ক্যান্সার আমাদের কাছে এত পরিচিত ছিল না। ক্যান্সারের প্রকৃত কারণ সম্পর্কে এখনও কোনো প্রকৃত ও পর্যাপ্ত তথ্য চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের জানা নেই। সেজন্য ক্যান্সার সেলকে টার্গেট করা এবং সঠিক প্রতিরোধ বা প্রতিকার উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। শরীরে কোটি কোটি সেল বা কোষ রয়েছে। প্রতিনিয়তই অসংখ্য কোষ ধ্বংস হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে নতুন কোষ তৈরি হয়ে শূন্যস্থান পূরণ করে ফেলে। কোষ বিভাজনের মাধ্যমে নতুন নতুন কোষ প্রস্তুতের এবং বয়োবৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি শরীরে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। এটি একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কিন্তু কোনো বিশেষ অবস্থা বা বস্তুর কারণে কোনো সেলের জিনের গঠন পরিবর্তন হয়ে গেলে সেই কোষ শরীরের কেন্দ্রীয় হুকুম ও বিধিনিষেধ অমান্য করে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বাড়তে থাকে। সাধারণত ভাইরাস, বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ, তাপ বিকিরণ এবং অক্সিজেন সেলের জিনের পরিবর্তন সাধন এবং ধ্বংস করে থাকে। এ পরিবর্তন বা ধ্বংস বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ফ্রি র‍্যাডিক্যাল সৃষ্টির মাধ্যমে সংগঠিত হয়। ফ্রি র‍্যাডিক্যাল অত্যন্ত বিক্রিয়াশীল রাসায়নিক বস্তু। অক্সিজেন ফ্রি র‍্যাডিক্যালে রূপান্তরিত হয়ে কোষের বিভিন্ন রাসায়নিক যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য পদার্থকেও ফ্রি র‍্যাডিক্যালে রূপান্তরিত করে দেয়। এই বিক্রিয়া এভাবে অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই ধ্বংসাত্মক চেইন বিক্রিয়া প্রতিহত ও বন্ধ করার জন্য একটি অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট প্রয়োগ করা না হয়। কোষের ডিএনএ ধ্বংসের অন্যতম কারণ এই চেইন বিক্রিয়া। এছাড়াও বিভিন্ন রাসায়নিক বস্তু ক্যান্সার কোষ সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে থাকে। এসব পদার্থকে কারসিনোজেন বলা হয়। কোনো রাসায়নিক পদার্থ বা তার অংশবিশেষ ডিএনএ'র সঙ্গে যুক্ত হয়ে বা কারসিনোজেন অথবা তাপের বিকিরণ কোষের ডিএনএ'কে উদ্দীপিত করার মাধ্যমে তার স্বাভাবিক গঠন ও কার্যক্রমে পরিবর্তন ঘটিয়ে অস্বাভাবিক কোষ তৈরিতে সাহায্য করে। এ কোষ তখন আর অন্য কোনো নিয়ন্ত্রণ মানে না। মাস থেকে বছরের মধ্যে এই কোষ দ্রুত বৃদ্ধির ফলে নির্ণয়সাধ্য একটি বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। এরূপ বস্তুপিণ্ডকে আমরা টিউমার বলে থাকি। টিউমারের আকার বৃদ্ধির জন্য সাধারণত অক্সিজেন এবং পুষ্টি সরবরাহের প্রয়োজন হয়। এ সরবরাহ পর্যাপ্ত না হলে টিউমার একটি মটরদানার চেয়ে বড় হয় না। টিউমারে রক্ত সরবরাহ থাকার কারণে টিউমার থেকে ক্যান্সার সেল বিচ্ছিন্ন হয়ে শরীরের বিভিন্ন স্থানে রক্তের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে এবং এর ফলে শরীরের বিভিন্ন অংশ ক্ষতিকর ক্যান্সার কোষ কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই প্রক্রিয়াকে মেটাস্ট্যাসিস বলা হয়।

চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মতে, ক্যান্সার প্রতিরোধ, প্রতিকার বা ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগীদের বেঁচে থাকার সময় বৃদ্ধির ওপর খাবারের স্পষ্টত কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা দৈনন্দিন জীবনে যেসব খাবার খাই, তার মধ্যে কিছু কিছু খাবার ক্যান্সার সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে এবং কিছু ক্যান্সার প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখে।

ক্যান্সারের জন্য উপকারী খাদ্যদ্রব্যে উপস্থিত বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ বিভিন্ন জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শরীরে টিউমার সৃষ্টিতে বাধা সৃষ্টি করে বলেও বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় দেখা গেছে। কিন্তু এটা মনে করার কারণ নেই, পরিণত অবস্থায় খাবার ক্যান্সার প্রতিরোধ বা প্রতিকারে খুব বড় একটা ভূমিকা রাখে। তবে এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, নিয়মিত খেলে কোন কোন খাদ্যদ্রব্য ক্যান্সারের ঝুঁকি বহুলাংশে কমাতে সক্ষম।

সবুজ শাক-সবজি ও ফলমূলে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট রয়েছে। ভিটামিন সি, ভিটামিন-ই এবং বিটা কেরোটিন অত্যন্ত পরিচিত ও গুরুত্বপূর্ণ অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। এসব অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সেলে অবস্থিত অক্সিজেন ফ্রি র‍্যাডিক্যাল বা অন্যান্য ফ্রি-র‍্যাডিক্যালকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে ডিএনএ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ পদার্থের ধ্বংস রোধ করে থাকে। ফলে সেল মারাত্মক ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। কমলা, লেবু, টমেটো, পেয়ারা, কাঁচামরিচ, ফুলকপি, পালং শাক, কলিজা, কালোজাম, আঙুর, ফুটি, আনারস, জাম্বুরা, স্ট্রবেরি, বাঁধাকপি ইত্যাদি ভিটামিন-সি'র উৎকৃষ্ট উৎস। যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য, বিশেষ করে ভোজ্যতেলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-ই পাওয়া যায়। শাক-সবজি, ফলমূলও ভিটামিন-ই'র খুব ভালো উৎস। হলুদ শাক-সবজি ও ফলমূলে রয়েছে প্রচুর বিটা কেরোটিন। সাম্প্রতিককালে পরিচালিত এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় আঙুর ও রেডওয়াইন থেকে রেসভারেট্রল নামের একটি উৎকৃষ্ট ও কার্যকর অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট আবিষ্কৃত হয়েছে। রেসভারেট্রল চর্ম ক্যান্সারের বিরুদ্ধে খুব কার্যকর বলে পরীক্ষায় দেখা যায়। সবুজ চায়ে প্রচুর পরিমাণে পলিফেনোল পাওয়া যায়। এসব পলিফেনোল কোনো কোনো সময় অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে ভিটামিন-সি বা ভিটামিন-ই'র চেয়েও বহুগুণ বেশি কার্যকর বলে প্রতীয়মান হয়। টমেটোতে রয়েছে লাইকোপিন নামের একটি চমৎকার কার্যকারিতাসম্পন্ন অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট। কিন্তু তাজা পাকা টমেটো থেকে লাইকোপিন পাওয়া দুষ্কর বলে রান্নার মাধ্যমে এর আঁশ থেকে লাইকোপিন আলাদা করে নিতে হয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে, যারা নিয়মিত টমেটো

খায়, তাদের ক্ষেত্রে ক্যান্সারের হার অর্ধেকেরও কম। স্তন, ফুসফুস ও অন্ত্রের ক্যান্সারের ক্ষেত্রে লাইকোপিন অত্যন্ত উপকারী।

দৈনন্দিন জীবনে আমরা তরিতরকারির সঙ্গে প্রচুর রসুন ও পেঁয়াজ খেয়ে থাকি। অনেকে বিভিন্ন রোগের প্রতিকার হিসেবেও কাঁচা রসুন বা পেঁয়াজ খেয়ে থাকেন। বলা হয়ে থাকে, রসুনের বহুগুণ। রসুন ও পেঁয়াজে এলাইল সালফাইড নামের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাসায়নিক পদার্থ রয়েছে। এলাইল সাল্‌ফাইড প্রো-কারসিনোজেন থেকে কারসিনোজেন বা অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্য বা তাদের ভগ্নাংশ প্রক্রিয়াকরণে বা প্রস্তুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এনজাইমের উৎপাদন প্রতিহত করার মাধ্যমে ক্যান্সার সৃষ্টি প্রতিহত করে। এলাইল সালফাইড তৈরি হওয়ার জন্য রসুন বা পেঁয়াজ ছোট ছোট করে কেটে বা পিষে ১০ থেকে ২০ মিনিট উন্মুক্ত স্থানে ফেলে রাখা প্রয়োজন। কাটা রসুন বা পেঁয়াজের চেয়ে রস খাওয়া উত্তম।

ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ব্রকলিতে রয়েছে সালফোরাফেন নামের এক ধরনের রাসায়নিক বস্তু। সালফোরাফেন এক ধরনের এনজাইম প্রস্তুতে সাহায্য করে যার কাজ হল সেল থেকে ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ বা তার ধ্বংসাবশেষকে অন্য বস্তুর সঙ্গে সংযুক্ত করে শরীর থেকে বের করে দেয়া।

সেলের প্রতিরক্ষা ব্যূহ ব্যর্থ হলে ক্যান্সার কোষ বিভক্তির কারণে অবস্থার অবনতি ঘটার বিরুদ্ধে প্রথম কাজ হল ক্যান্সার সেলকে ধ্বংস করা অথবা এর বিভক্তি রোধ করা। কর্ন তেলের ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড সেল বিভাজন ত্বরান্বিত করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে যেসব তেলে ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিড রয়েছে, তা বর্জন করা বাঞ্ছনীয়। সেলের বিভাজন রোধের মাধ্যমে ক্যান্সার প্রতিহত করার জন্য মাছের তেলের ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড খাওয়া উচিত। ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সেল থেকে ওমেগা-৬ ফ্যাটি অ্যাসিডকে বিতাড়িত করে সেল বিভাজনের গতি ও পরিমাণ হ্রাস করে দেয়।

রিপ্রোডাকটিভ সেলগুলো সাধারণত ক্যান্সারপ্রবণ হয়। কারণ এসট্রোজেনের মতো সেক্স হরমোন এসব সেলের গঠন ও বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। মহিলাদের স্তনের সেল গঠন ও বৃদ্ধিতে এসট্রোজেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকায় মহিলারা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয় বেশি। সয়া খাবারে আইসোফ্ল্যাভোন নামে একজাতীয় রাসায়নিক পদার্থ থাকে, যা এসট্রোজেন রেসেপ্টরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এসট্রোজেনের কার্যকারিতাকে প্রতিহত করার মাধ্যমে ক্যান্সার সৃষ্টির বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর জন্য বেশি করে সয়া খাবার খাওয়া উচিত।

সব রকম প্রতিরক্ষা ব্যূহ ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার কারণে ক্যান্সার সেল বিভাজন ও বৃদ্ধিলাভ করে টিউমারে পরিণত হয়ে গেলে আর করণীয় বেশি কিছু থাকে না। টিউমার সেলের জীবনধারণ ও বৃদ্ধিলাভের জন্য রক্তপ্রবাহের মাধ্যমে অক্সিজেন ও পুষ্টি গ্রহণ আবশ্যক। টিউমার সেলে বিদ্যমান গ্রোথ ফ্যাক্টরের কারণে টিউমারে নতুন নতুন রক্তনালী তৈরি হয়। এসব রক্তনালীর মাধ্যমে টিউমার সেল অক্সিজেন ও পুষ্টি পায় বলে টিউমার আয়তনে বাড়ে। অন্যদিকে এসব রক্তনালীর মাধ্যমে রক্ত টিউমার থেকে ক্যান্সার সেল শরীরের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে দেয়, যা জীবনের জন্য অতি ভয়ংকর। এ পরিস্থিতিতে হলুদের কুরকুমিন ও আঙুরের রেসভারেট্রল গ্রোথফ্যাক্টর দমনের মাধ্যমে নতুন রক্তনালী প্রস্তুত প্রতিহত করে থাকে। নতুন রক্তনালী তৈরি হতে না পারলে টিউমার সেলে রক্তের মাধ্যমে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টি পৌঁছাতে পারে না এবং টিউমার থেকে ক্যান্সার সেল শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াতে পারে না বলে অবস্থা কিছুটা হলেও নিয়ন্ত্রণে থাকে। এতে করে ক্যান্সারের রোগী বেশিদিন না বাঁচলেও আয়ু কিছুদিন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ক্যান্সার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে অ্যাসকরবিক এসিড বা ভিটামিন-সি'র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এ লেখার প্রারম্ভে ভিটামিন-সি'কে একটি উৎকৃষ্ট অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু ভিন্ন পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমেও ভিটামিন-সি ক্যান্সার প্রতিরোধ ও প্রতিকারে কার্যকর অবদান রাখতে পারে বলে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় পরিলক্ষিত হয়েছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে স্কার্ভি রোগের প্রতিকারে ভিটামিন-সি ব্যবহৃত হয়ে এলেও ক্যান্সারের ক্ষেত্রে ভিটামিন-সি'র উপযোগিতার কথা মানুষ জানতে পারে সাম্প্রতিককালে। ভিটামিন-সি শরীরে কোলাজেন তৈরির মাধ্যমে সেলের গাঁথুনি মজবুত রাখে। কোলাজেনের ভূমিকা ইট বা কনক্রিটের মধ্যবর্তী স্থানে চুন-সুরকি বা বালু-সিমেন্টের মতো। ভিটামিন-সি কোলাজেন তৈরির মাধ্যমে সৃষ্ট মজবুত দেয়াল দিয়ে টিউমারকে বৃত্তাবদ্ধ করে রেখে শরীরের বিভিন্ন অংশে ক্যান্সার সেলের দ্রুত বিস্তার প্রতিহত করে। অন্য এক তত্ত্বে বলা হয়েছে, ভিটামিন-সি শরীরে ক্যান্সার সৃষ্টিকারী ভাইরাসকেও কার্যকরভাবে প্রতিহত করতে পারে। পরীক্ষায় দেখা গেছে, টিউমার অপারেশনের ক্ষেত্রে ভিটামিন-সি ক্ষত পূরণের সময় অতি দ্রুত কমিয়ে আনতে সক্ষম। বিভিন্ন ইপিডেমিওলজিক্যাল পরীক্ষা ও পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, প্রাকৃতিক উৎস থেকে গৃহীত ভিটামিন-সি ব্রেস্ট, ব্লাডার, সারভিক্যাল, কোলরেক্টাল, লাং, প্যানক্রিয়াস, প্রোস্টেট ও অন্ত্রের ক্যান্সারে কার্যকর ভূমিকা রাখে। ক্যান্সারের ঝুঁকি কমানোর জন্য প্রতিদিন পর্যাপ্ত ভিটামিন-সি গ্রহণ অতি উপকারী।

মারণঘাতী রোগ ক্যান্সারের কার্যকর প্রতিরোধ ও প্রতিকার আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে সারা বিশ্বে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার ব্যয় হয় প্রতি বছর। প্রকৃত প্রস্তাবে এই ব্যয়ের স্রোত বইতে শুরু করে এই শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে, যখন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কিন্তু লাখো-কোটি ডলার ব্যয় করেও বিগত ৪০ বছরে ক্যান্সারের মৃত্যুহার কমিয়ে আনা সম্ভব হয়নি। বরং কোনো কোনো দেশে ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা বিজ্ঞানে বহু জটিল রোগের প্রতিরোধ ও প্রতিকারে যত সাফল্য অর্জিত হয়েছে, ক্যান্সারের বেলায় তত হয়নি। ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য সেই কথিত 'সোনার হরিণ' বা 'ম্যাজিক বুলেটে'র সন্ধানে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সেই মোক্ষম ম্যাজিক বুলেটটির সন্ধান মিলবে।

খাদ্যদ্রব্য হয়তো ক্যান্সার পুরোপুরি নির্মূল বা উচ্ছেদ করতে পারবে না; কিন্তু উপযুক্ত খাবার পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্রহণ করলে নিঃসন্দেহে মানবদেহে ক্যান্সারের ঝুঁকি বহুলাংশে কমে আসবে।

ড. মুনীরউদ্দিন আহমদ : *প্রফেসর, ফার্মেসি অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*
drmuniruddin@gmail.com